ভৌতিক কবিতা

সব্যসাচী সান্যাল

বিষয় মানুষকে বড় বস্তু করে তোলে। মানুষ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে চায়, সমাজে, পত্রিকায়। আর গ্রহণযোগ্য বস্তু তাই, যা সংজ্ঞায়িত, আপাদমস্তক, জাতে নিরাপদ। ফলে বিষয়ী মানুষকে, নিজেকে আয়নায় দেখতে হয় বারবার—সংজ্ঞার সাথে, নিদেন পপুলার ধারণার সঙ্গে তার মিল আছে কি-না—মাথার টাকটি, পকেটের চিরুনি; দেখা পড়ে। অথচ তর্জনী যেখানে মধ্যমার সঙ্গে কথা বলে, সেখানে নিকোটিন, কালচে হলুদ ছোপ—সে কি চোখে পড়ে?

সংজ্ঞা সাদা-কালো—হয় সমস্ত রঙ সে রিফ্লেক্ট করবে নয় শুষে নেবে—দ্বিমত, অনিশ্চিতি, সংশয়, দ্বিধার বিপক্ষে এই অবস্থান—চিরকাল ভালো লাগে নাকী! ফলে, ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে লাগুক না লিবার্টি!

হোক নানা কথা, কিঞ্চিৎ আলাপ—সাগাপাধারাধাগাধা... তৎসমে কিছু কালোয়াতি— মনে রেখ, ‘কল্মাষপাদ’ (দৃশ্যমান বায়ু) গ্রন্থে ভবভূতি লিখিয়া গেছেন—
‘শূন্য কলসে, অনুস্বর উড়ে এসে বসে
সমস্কিতে শব্দ হয় ঢক্কাং ঢক্কাং’

১

বিশ্বাস :
ভূত একটা বাস্তবিক ব্যাপার। যা কিছু সিদ্ধান্তের ফসল তাই বাস্তবিক। আমাকে কী হন্ট করবে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার পর ভূত নির্মিত হয়। তাকে অতীত বলে ডেকে ফেললেও পরিস্থিতির নড়চড় হয় না।

এটুকু ড্রাফট। এতে সিদ্ধান্তের উদাহরণগুলি জুড়বে। সুশীলা পিসি রাতে ব্যথায় ককিয়ে উঠবে। বড় বড় চোখে দেখবে, এলোপাথাড়ি শাবল চালাচ্ছে তার মরদ, যে কবেই অন্যত্র স্যাঙা করেছে,

এই মুহূর্তে অন্য কারো তেলচিটে বিছানায় ঘুমোচ্ছে, ঠোঁটের কোণে গ্যাঁজলা, তাতে চাঁদের আলো ঠুকরাচ্ছে।

আশির দশকে যা কিছু জন্মাল তার বেশ কিছু কুৎসিত, যা টিকে গেল, আর পরের দশকগুলোতে নিজেদের আদলে যা যা পয়দা করল তার সবটাই কুৎসিত। সারা য়োরোপ জুড়ে চৌকো ঢাউস বাড়ি; দু'তিন তলের, 'ওই মেয়েটির কাছে, সন্ধ্যাতারা আছে'-টাইপ কবিতা, লাহিড়িবাবুর কবচকুণ্ডল...সাম্প্রদায়িকতা; যদিও জন্ম তার আদিঅন্তহীন, তবে এ দশকে বুস্টার প্রবল। সিদ্ধান্ত ব্যাপারটা ক্রিটিক্যাল থিংকিং থেকে আসে, অন্তত আসা উচিত, নিজের নিজের ভূত বেছে নেওয়াও তারই মধ্যে পড়ে। আমার পারিপার্শ্বিক নিয়ে বাছবিচারের ক্ষমতার জন্মও আশির দশকে, ফলে এ লেখাও যে কুৎসিত, তা অনস্বীকার্য।
ভূতের গল্প শুনতে গেলে সুশীলা পিসির কাছে ফিরে যাওয়া ভালো, তার তেলচিটে বিছানায়, তবে মনে-প্রাণে শিশুটি হয়ে। সুশীলা পিসির মুখের আদল ছিল পামেলা আন্ডারসনের মত। অন্তত আশির দশকে।

—

ভূত এক বিশ্বাসের ব্যাপারও। ছবি ও বিশ্বাস নিয়ে রঙ্গ, অন্য কেউ করেই ফেলেছে। তবে ছবি সম্পর্কে আমি অন্য কিছুও ভাবি—যথা, জল তরল, এঁকে ফেললেই সে দ্বিমাত্রিক, আর যা কিছু দ্বিমাত্রিক তা আদতে কঠিন, প্রবেশাধিকার নেই তাতে কারো—যুদ্ধজর্জরিত দেশে বিদেশী এম্ব্যাসি যেমন, কিছু ওরকম...লখিনবাসর ত্রিমাত্রিক হলে তাতে ছিদ্র জাগে, বিপর্যয় ঘটে, পেরিফেরিঘাটে বেহুলা বাধ্য হন নাচে। বস্তুর তরল অবস্থা আংশিক-বিমূর্ত— যে কোন মাতাল এই আপ্তবাক্য জানে। ফলে বিশ্বাসকেও আমি আংশিক বিমূর্ত রাখি—নিরেট সমাজে দারুবৎ তরল, এই আপাতত প্রকৃষ্ট উপায়। কবিতাও লিখে ফেলি—

বিশ্বাস এক বর্ণ-গন্ধ-আকারহীন তরল
গ্রীষ্মে, মিশলে বস্তু, মিঠাস সে, জিভের গোড়ায়
ঘন করে লালা রস, লাংস মুচড়ে ওঠে
তুঁতে কামিজ তোমার, ভিজিয়ে রেখো না বিশ্বাসে,
বস্তু ফিকে হয়ে যাবে, বিনা প্ররোচনায় সারারাত
অন্ধকারে ডানার মত ছটফট করবে
বিশ্বাসকে অনন্ত সময় ঢাল বেয়ে গড়িয়ে যেতে দিলে,

তার প্রকাণ্ড কাছিম পিঠ, বাতাসী রঙের ত্বক
প্রতিভাত হয়—বিশ্বাসী মানুষেরা এই সমস্ত নিশ্চিতি রাখে।
বিশ্বাস নিয়ে আমি তেমন কিছুই জানি না।
আমি ভরসার কথা জানি।
আমার ওপর কেউ ভরসা রাখলে
হাড় পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে ওঠে।

অবিশ্বাস :
'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইলো না কেহ'।
(ফার্নান্দো পেসোয়া পর্তুগালের কবি। বলা হয়, পর্তুগীজ ভাষার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য চারজন কবি পেসোয়া। পেসোয়া নিজনামসহ মোট চারটি ডিসটিংক্ট লেখকসত্তা তৈরী করেন— রিকার্দো রেইস, আলভেরো ডি কাম্পো, আলবার্তো কেইরো নামে। এ ছাড়াও 'দ্য বুক অফ ডিসকোয়ায়েট'এ বার্নাদো সোরেস নামে আরো এক সত্তার অটোবায়োগ্রাফি, পেসোয়ার নিজস্ব একাকিত্ব যার পরতে পরতে)

পেসোয়া পড়তে গিয়ে মনে হয়, যারা এত কথা বলে 'দ্য বুক অফ ডিসকোয়ায়েট' নিয়ে, তারা কি বইটা পড়েছে? আদৌ? আমি নিজে রেকমেন্ড করি এতজনকে, আমিও কি পড়েছি? নির্বান্ধব হতে চাওয়াটা যে এত বড় এক ডিসকোর্স, এত আয়োজন, জাস্টিফিকেশান লাগে, এত শব্দব্যয়, শুধু নিজের সঙ্গে কথোপকথন নয়, দৃশ্য আঁকতে হয়, শহরের, মেঘলা আকাশের, সমুদ্রসৈকত, মরুভূমির, জনবহুল অফিসস্পেসের, সর্বোপরি সেই সমস্ত জায়গায় নিজেকে কেয়ারফুলি প্লেস করতে হয়, অথচ নির্বান্ধব হয়ে পড়ার পর এসমস্তকে অপচয় মনে হয়— জল, টেম্পারেচার কমতে থাকলে, তার ঘনত্ব বাড়ে, আর চার ডিগ্রির থ্রেশহোল্ডের নিচে নেমে গেলে, সহজ, গুরুত্বহীন তার ভেসে ওঠা। বরফের আস্তর এত সহজে ওপরে ওঠে বলেই জলের মধ্যেকার মানুষেরা বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। আমি নির্বান্ধব তাই আমার বন্ধুরা বেঁচে আছে, এটুকু ভেবে নেওয়ার জন্য যুক্তির প্রয়োজন আর হয় না।

তাছাড়া অন্য কোনো মানুষের স্পেকুলেশানসমূহ যার কোনো এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স নেই, সে আমার যুক্তিবোধ, শিক্ষা, ফিল্টার, এমনকি ইন্দ্রিয়দের রিসেপশানকেও গড়ে তুলছে এটা মানুষ

তখনই সহজ ভাবে নিতে পারে, যখন সে নিজেকে বিশ্বাস করে না। নিজের অনুভূতিকেও সে অন্যের যুক্তি আর অজার্ভেশানের ফালে যাচাই করে উঠতে চায়।
নির্বান্ধব মানুষ হিসেবে আমি সত্যাসত্য বিচার না করে হৃদয় এবং মন সমার্থক ধরে নিই। 'চিত্ত' শব্দটাও মনে ধরে।

চিত্তদা দুধ দিত। চিত্তরঞ্জন ঘোষ। অসুখবিসুখ হলে, তাঁর ভাই, হৃদয়। পরিষ্কার টেরি কাটা, টেরিলিন বা টুইলের শার্ট। হৃদয়ের মুখে পক্সের দাগ ছিল; হৃদয়ে বসন্ত, এই কন্সট্রাক্ট আমি দশ বছর বয়েসেই করে ফেলি কারণ সে বয়সেও অ্যাটাচমেন্ট নামক ব্যাগেজ আমাকে মায়োপিক করে রাখেনি।

হৃদয়ে যার বসন্ত থাকে, দুধের ক্যান সমেত তার উড়ন্ত সাইকেলে গলিতে ল্যান্ড করবে, এটা কষ্টকল্পিত নয়। বসন্তহৃদয় বস্তুত নিদয়, সাইকেল পাঁচিলে ঠেসিয়ে, বারঘরে সটান ঢুকে চৌকিতে শুয়ে ঠ্যাং নাচায়, বলে— ফ্যান চালা। গান চালা বাবু— ডিস্কো দিবানে। আমি ত্রস্ত, কাচা চাদরে ঘোষের বাচ্চার পদরেণু, তাও পেশায় গয়লা, শুধু জাতে নয় ক্লাসেও কনফ্লিক্ট— কমিউনিস্ট বাড়িতেও কি ক্ষমার্হ? যাই হোক অ্যাটাচমেন্ট না থাকার কারণেই র‍্যান্ডম দয়া মায়া থাকে, মানুষ, শ্রেণিচেতনা, আইডিওলজি কেউই পেড়ে ফেলতে পারে না। ফিলিপ্সের রেকর্ড প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত চালাই— হৃদয় শুনতে পায়; 'আমি হৃদয়ের কথা...' আমি শুনতে পাই বজ্রসেনের গলা—'ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা...'। কোন গান চালানো হলো জানা নেই অথচ দুজন দুরকম শোনে, তার একমাত্র কারণ সেই সময় রবীন্দ্রনাথ শ্রেণিশত্রু না শ্রেণিসখা সে ব্যাপার নিয়ে সংশয়। হৃদয়, হৃদয়ের কথা জানে, আমি জানি কি-না সেও তো সংশয়ের।

সংশয় ব্যাপারটা আদতে ইমপ্র্যাকটিক্যাল। যা সমাধান দেয় না তা প্র্যাকটিক্যাল হতেই পারে না, সহজ ইকুয়েশান তো। প্র্যাকটিক্যাল হল বাটামের ভয়। আর সমাধান হলো আমাদের ৩-৪০০ বছর পুরনো কেজি বারোর অষ্টধাতুর গোপাল। কমিউনিস্ট বাড়িতে মুসলমান কেন ঢুকবে না? বাড়িতে গোপাল। গয়লা কেন বিছানায় বসবে না? বাড়িতে গোপাল। নাবোকভ কেন তালাবন্ধ আলমারিতে থাকবে এর উত্তরও নিশ্চয়, বাড়িতে গোপাল।

গোপালের এ নিয়ে ভ্রুক্ষেপ আছে কি-না জানা নেই। সে ঘাঘরায় (পরানো সহজ) অমলিন। মুলতানি মিট্টিতে তার গাত্রমার্জন হয়, রা-টি কাড়ে না। চোখে এনামেল পেইন্ট লাগে। জন্মাষ্টমীর

দিন ব্রাসোর গন্ধ পায়েসের ওপর এসে বসে। ঠাকুমা ভোর ভোর চিৎকারে মাথা খায়— ও মেজ, ও ছোট, কী যে দেখনু! তর্করত্ন আইসেন, অদ্বৈতবাদী, গোপাল তো হামাগুড়ি দিয়া বাইরিয়া কী তর্ক কী তর্ক! মা, গুসকরা যাওয়ার প্ল্যান বাতিল করে, স্বপ্নে যে গোপাল বলে— যাসনে। ভোরের বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে অ্যাকসিডেন্ট হয়, অবশ্য গুসকরা ছাড়িয়ে, সেই বর্ধমানে, হতাহত জিরো।

বাজে কথা থাক। ব্যাপার নির্বান্ধবের হৃদয়ের কথা নিয়ে। হৃদয় যে বারঘরের চৌকিতে ঠ্যাং নাচায়, সে আমি কাউকে বলিনি, ব্যাকুল হলেও। শুধায়নি তো কেহ।

২

লেখার সময় নিঃসঙ্গতা জরুরী। চারপাশের ভিড়ে নিঃসঙ্গ হওয়ার প্রকৃষ্ট এক উপায় হলো এইটুকু ভেবে নেওয়া—আমার পরিচিত সমস্ত মানুষ পাওলো কোয়েলিয়ো-র লেখা ভালোবাসে (পান থুকে বেগম বললেন—কোয়েলিয়া গান থামা)।

গান থামলে—

নিজেকে সবসময় সিরিয়াসলি নেওয়া প্রোডাক্টিভ নয়। সংশয়ে ভোগাও নয়। যদিও এই হলো মানুষের স্টেট-অফ-বিয়িং-এর বাইনারি। অনুমতি পেলে বলি, লেখার সময়টা ঔদ্ধত্য কাজে লাগে, আর লেখার ফর্মুলেশান—যা অ্যানালিসিস ও সিন্থেসিস—এর সময়; সংশয়। এডিটিং-এ এই দুইই আর কিছু ধূর্ততা, যা পরাজাগতিক (শেষ শব্দ এইমাত্র বসালুম)।

এ সমস্ত লেখা কবিতা। কবিতা ব্যক্তিক্ষতি কিছু করলেও করতে পারে, কিন্তু মাসকে কালেক্টিভ আত্মহত্যায় চালিত করে বলে কোনো উদাহরণ নেই (লেমিংরা কবিতা পড়ে না; প্রমাণিত, জাটিংগা গবেষণাধীন), আমি ধর্ম-ধুরন্ধর প্রফেটদের কথা বলছি না কিন্তু। বা ভার্সে লেখা যুগদর্শন, বা ন্যারেটিভ। কবিতা মানে ধরেই নেওয়া যায় সামাজিক ভাবে নন-সিরিয়াস, সুকুমার বা জীবনানন্দ, নিদেন সুভাষ সুবোধ সুনীলের সপাট বাক্যসমূহ ভীড়কে দিনের পর দিন চালিত করবে এমনটি চোখে পড়েনি। সেন্সিবল মানুষেরা মিসইন্টারপ্রিটেশানের কথা বলে—নীৎশে যেমতি..., কিন্তু জেনোসাইড দূরে থাক, কেউ কি দেখেছে— খোল, কে পেন্টুল আজাদ হ্যায়ঁ তেরে, বলে কোনো আলবার্ট পিন্টো ন্যুড কলোনিতে ঢুকে পড়ছে?

তাই আমি, যে ইনফ্লুয়েন্সারদের ভয় পাই, যাই লিখি, তাই কবিতা, ধরে নিয়েই লিখি, মাহূর্তিক ব্যাপার-স্যাপার, আর এডিট করে ঢোকাই স্ববিরোধিতা। মাহূর্তিক মানেই মেয়াদ স্বল্প, এই পূর্বশর্ত; প্রিকন্ডিশান। নিরাপদ, আর কী।

ওপরের ড্রাফটে যে ডিসক্লেমার জুড়বে—

ব্যক্তিমানুষের, পড়ুন পাঠকের, ক্রিয়েটিভিটিকে ডিসকাউন্ট করা অনুচিত। কবিতা যে ব্যক্তিমানুষের ক্ষতিসাধনে সক্ষম তার এক উদাহরণ; ধীমান চক্রবর্তীর কবিতা—'দড়ি'। ধীমানের পাড়ার এক ডিপ্রেসড যুবক, কবিতাটি, যার শেষের লাইন 'সব দড়ি পচে যায়, আত্মহত্যার জন্য একটুকরো দড়িও আর পড়ে থাকেনা' পড়ার পর সিলিং ফ্যান থেকে নিজেকে ঝুলিয়ে দেয়। ঘটনাটি মিথের মর্যাদা পেলে, সেই মৃত্যু, যার থেকে মানুষটি সরে যায়, শোকাশোক ভুলে, অন্তত আমার চোখে ধীমানের টুপিতে একটি পালকে পরিণত হয়। এর পর একদিন স্বপ্নে দেখি আমি ও ধীমানদা, এক জিভ ঠিকরে ওঠা বিস্ফারিত চোখ যুবকের মৃতদেহের ওপর পা রেখে ছবি তুলছি। স্বপ্নে বন্দুক ও কলমের শ্রেণিবিভাগ তেমন হয় না, তাই, হাতে, উইনচেস্টার রিপিটার।
(এস্থলে উইনচেস্টারের বদলে রেমিংটনের উল্লেখ যুক্তিযুক্ত হত, তারা টাইপরাইটার এবং বন্দুক (মসী অ্যান্ড অসি) উভয়ই বানাত—এই নিরুল্লেখ, কারণ ২০২০-তে, কম্পানির গণেশ উল্টেছে।)
এর পরও কবিতা লিখি। একই সঙ্গে তরল থেকে তরলতর ভাঁড়ামি। অধিকাংশ জীবিত মানুষের মত হাইন্ডসাইটের সুবিধা নিয়ে নিজের ক্রিয়াকলাপকে সাইকোঅ্যানালাইজ করলে, বুঝতে পারি, এ এক প্রচেষ্টা, নিজেকে পাঠকের কাছে অবিশ্বাসযোগ্য করে তোলার।

কুকুর ডাকছে, সবুজ কুকুর এক, তার গোঙানির তোড়ে দরজা সপাটে নিজেকেই বন্ধ করে নেয়—

বন্ধ দরজার পিছনে এক শীর্ণ খাট থাকে
বন্ধ দরজার পিছনে শীর্ণ এক পিঠে
মাদুরের দাগ গেঁথে থাকে
বন্ধ দরজার পিছনে কুঁজো থেকে
গেলাসে অন্ধকার গড়িয়ে নেয় কেউ
বন্ধ দরজার পিছনে বজ্রবিদ্যুতহীন
ঘিনঘিনে বৃষ্টি হয়ে চলে

বন্ধ দরজার পিছনে ডানহাতের তিন আঙুল দিয়ে
বাম কনুইয়ের কাছে শিরা খুঁজে চলে কেউ
বন্ধ দরজার পিছনে যা যা ঘটে তার কোনোটাই
তেমন ভীতিজনক নয়
অন্তত যতক্ষণ কেউ আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করতে শিখছে

শুধুশিষ্ট :
আমাকে, এক পরিচিত, কবি অভিহিত করলে প্রথমে খুশীই হই, যে, যা লিখি তা নিশ্চয় কবিতা, এর পর সংশয় আসে, কবি বলে সাইড করতে চাওয়া হয়নি তো, দুধে-ভাতাড়ু বোধে। অপর এক এক্সপ্ল্যানেশান স্বান্তনা যোগায়— সিম্বলিক ফ্লেভার। এই যা ইশকুলে বেতের সামনে দাঁড়িয়ে শিখতে হয়; কবি কীইই বলিতে চাহিয়াছেন! এই সম্ভাবনাকে খানিক নেড়ে চেড়ে দেখতে গিয়ে খেয়াল হয়— সিম্বলিক বলতে গেলে, দ্য ইউ-এস-অফ-এ-র সমস্ত প্রেসিডেন্টই তো সিম্বলিক— টেডি, কেনেডি, ফ্র্যাংকি, ওবামা— সঅব। অমিয় চক্রবর্তী* সাতজন আমেরিকান প্রেসিডেন্টকে নিয়ে লিখেছিলেন— ‘একটি কথার দ্বিধাথরোথরোচূড়ে, ভিড় করেছিল সাতটি অমরাবতী’... ‘কথা’-টি ‘আগ্রাসন’ নিশ্চয়ই (যে কোনো বিদেশী ভাষায়, ‘আমেরিকান ড্রিম’-এর তর্জমা), দ্বিধা শব্দটা নিয়ে দোটানা রয়েছে কিছু, সেও প্রতীক নিশ্চয়ই, ইষ্ট-অনিষ্ট, বেনেভোলেন্স মেলভোলেন্স -জাতীয় কিছুর।
আমেরিকাবাসী বন্ধু প্রায়শই বলেন, সব্য, তুই সায়কায়াট্রিস্ট দেখা। কারণ, এই এত লেখালিখি সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিশ্চয়ই কোনো নিহিত ডিসঅর্ডার। আমি এতটা বুঝি, ওনার মত মানুষ, যাঁরা প্রকৃত সুস্থ, তাঁদের একটা সহজ হ্যান্ডেল আছে, সুস্থতার, ভারসাম্য বজায় রাখার, স্পিভাক আছে, চমস্কি আছে, বাইডেন ভোটে জিতলে তার আনন্দ আছে।
আমেরিকা, যাকে আমেরিকার বাইরের মানুষ দেখতে পায় একমাত্র, সে হ্যামিল্টনের ভিশানের প্রডাক্ট। জেফারসন ভার্সাস হ্যামিল্টন কনফ্লিক্ট (১৭৯০ নাগাদ), হ্যামিল্টনের ভিশান যে শব্দ আকারে প্রকারে সপাটে ইংগিতে বারবার উচ্চারণ করতে চায়—তা, মাইট, প্রতিপত্তি, আপৃথিবী।
যাই হোক, ব্যাপার হলো, নিজেকে অত সিরিয়াস মনে না করাই শ্রেয়। ফলে আমোদের কারণেই লেখালিখি, এই। আর সেরিব্রাল কর্টেক্স মাত্রাধিক চাগিয়ে উঠলে।
ডিসক্লেমারঃ যারা নিজেদের সিরিয়াসলি নেয় না, তারা পরিচিত মানুষকে খুন করতে পারে। নিজেকে সিরিয়াসলি নেওয়ার অর্থ, অপরের মাথার আমিটিকে নিয়েও ভাবা, তাকে বাঁচিয়ে রাখা, তার পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।

এই সতর্কীকরণের প্রেক্ষিতে, এই মুহূর্তে, নিজেকে একটু সিরিয়াসলি দেখছি। যার কিছু নেই তার দ্বিধা আছে।

(*ভূতের কথায় দশচক্র মনে আসবে না, হয় নাকি! সুধীন্দ্র, অমিয় হন, দত্ত; চক্কোত্তি। এ সমস্ত গৌণ যদিও। দশচক্র আদতে, আশ্রম মাঠের পারে লেডিজ হস্টেল, পাশেই সুরুচি, খাসা দইবড়া, কোল্ডকফি; তাও।)

৩

একটা অবজার্ভেশান অন্য কিছুকে প্রাসঙ্গিক করে তুলবে এটা ভাবতে ভয় পাই, নিজেকে ভয়, ইগোকে, আর একটা ভয় ভুলের, মনে মনে আওড়াই ‘ঐতিহাসিক’, তারপর মুচকি হাসি, নিজের ভুলকে ঐতিহাসিক ভাবতে পারাটাও ইগোর ব্যাপার। এক্সপার্ট নামের ইলেকট্রনিকস দোকান চালায় দু ভাই, চোয়ালে গোটি, ফ্রেঞ্চকাট বলে উপমহাদেশে, একজনের প্রশস্ত টাক অপরজনের সোনালির ফাঁকে টাকের আভাস। সোনালি আমাদের বোলপুরের বাড়িতে কাজ করেছিল কিছুদিন, পয়সা চুরি করত, ধরা পড়ার আগ অব্দি সে আমাদের রোজ বিকেলে লজেন্স খাওয়ায়। ‘সোনালি’ নিয়ে বিস্তারে গিয়ে লাভ নেই। তবে, বলে রাখা ভালো, এক বসন্তে সোনালি কাজে ঢোকে, মনে পড়ে, কুয়োর জল তখনো শীতল। গ্রীষ্মে কাজ ছাড়ে। কুয়োর জলে তখন প্রায় ৩-৪ ডিগ্রির ফারাক। আমি এক্সপার্টে কোডাক ফিল্মের রোল জমা দিই, বাইরের বেঞ্চ যার পাশে একলা রিভার-বার্চ, ঝকঝকে তামারঙ বাকল, তার ক্ষুদে পাতাদের ফাঁক দিয়ে অনাবৃত হাতে রোদ পড়ে, মিনিট পনের পরে বুঝতে পারি চামড়া জ্বলছে, হেমিংওয়ে ব্যাগে গুটিয়ে, প্রেসবাইটেরিয়ানদের কাফেতে ঢুকতে গিয়ে জ্বালা তীব্র হয়, হাতে লাল লাল দাগড়া জেগে ওঠে, বোলপুরে ৪৫ ডিগ্রিতেও কোনোদিন সানবার্ন হয়নি, এখানে বায়ুস্তরে দুঃখের প্রকার আলাদা, যা ইউভিকে সরাসরি চামড়ার ওপরে খসে পড়তে বাধা দেয় না। গতকাল সায়ন ভদ্র আমাকে গ্যালিয়ানোর মিররস পড়তে দেয়, পিডিএফ, প্রথম লেখাটি ভালো লাগে না, দ্বিতীয়টি ; ‘আ ফীস্ট অন ফুট’, যা আউট অফ আফ্রিকা থিয়োরির ওপর ভিত্তি করে; হাল্কা প্রীচি, জানি না গ্যালিয়ানো জানেন কি-না— এই বিষয়ে অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার রয়েছে, যেমন তুরস্কে নাৎসী গোলন্দাজ বাহিনীর এক মেজরের খুঁজে পাওয়া একটি মাত্র খুলি, যার ওপর ভিত্তি করে আউট অফ আফ্রিকা থিওরিকে ডিসক্রেডিট করার প্রচেষ্টা, আজ সেই জায়গার অনেকটা জুড়ে ব্যক্তিগত মালিকানা সুইমিং পুল ইত্যাদি— জনশ্রুতি, মালিক মাফিয়া, ওয়েল কানেক্টেড—ফলে খনন বারণ। বসন্তে সোনালি আসে, গ্রীষ্মের মাঝামাঝি চলে যায়। গালিয়ানোর বইটির প্রথম দুটি পিস আশাহত করলেও, আমি অতীতচারণের একটা

জাস্টিফিকেশান পাই। ঠিক কার্য-কারণের ব্যাপার নয় এসব। আলগা স্ট্রাকচার মানুষকে নিজের বুননে সাহায্য করে, কালরাত্রে কুকুর ডাকছিল, প্রবল, আজ সেই ডাক এই লেখার বুনোটে ঢুকে পড়েছে। সায়ন ভদ্রকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। প্রেসবাইটেরিয়ান দোকানের কফি আর ব্যাগেল শেষ, এক্সপার্টের দোকানে, প্রিন্ট নিতে ঢুকব, ২০০৩-এর বসন্ত, প্রিন্ট নিতে ঢুকব এটা জেনেও যে ক্যামেরায় তোলা ছবিও স্মৃতির অংশ, ফলে করাপ্টিবল। শেষের বাক্যটি খানিকটা ড্রামাটিক, যা আমার পছন্দ নয়, বরং নন-চ্যালেন্স ভালো, ভ্রু উপরে না উঠিয়েই অবাক হতে পারার মত ব্যাপার আর কী।

৪

এই লেখার ঠিক আগে, কেউ অবস্কিওরিটির কথা তুলবে। অভিযোগ। অভিযোগের উত্তরে পরে দেব, আগে অবস্কিওরিটি নিয়ে আলগা কিছু কথা বলা যাক—সে আমাকে কী'ভাবে আবছা করে তোলে, সে কথাও।

অবস্কিওরিটি তো আর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যা আড়ালে চলে গেল, দ্বিধা রেখে বা না রেখে, সে না থাকলে, নিদেন তার ধারণাটুকু, কুয়াশার কোনো অর্থই হয় না। এক অর্থ নির্মিত হয়, অপর অর্থকে আবছা করে তোলার জন্য, এরকমটি ভাবাও ভুল নয়। এই লেখাগুলো আমি ১৭ বছর আগে লেখার কথা ভাবি, তখন কংক জন্মায়, সে বছর ওর প্রথম জন্মদিনে বিরিয়ানি রাঁধি, লেখার কথা ভুলে যাই। কংক এ বছর ১৮-য় পা দেবে। ১৮-য়, ভোটাধিকার প্রাপ্তির অনুমোদন, এর আগের বছরগুলোকে আবছা করে তুলবে, এটা ভাবতেও আনন্দ হয়। সে বছর পায়েসও রেঁধেছিলাম। কাজু, ছোট এলাচ, তেজপাতা, ছিল, গার্নিশে দারুচিনির গুঁড়ো, সে ওয়াক তোলে, তারপর প্রতিবছর আমরা নিরাভরণ পায়েসে এলাচেত্যাদির স্মৃতিকে অবস্কিওর করার প্রচেষ্টা চালাই। লেখাও আজকাল সেরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পিছনে সেরকম গূঢ় অভিসন্ধি কিছু নেই। বাস্তবিক। যে কুলগাছে গতবছর ফলন ভালো হয়েছিল, এ বছর লাক্ষাকীট তার ডালে লেয়ার বুনেছে। লাক্ষা, যা সিল-মোহরের গালা, ভিনাইল আসার আগে লং-প্লে রেকর্ডে যার ব্যবহার নিয়ে কারো আপত্তি ছিল না।

এ প্রসঙ্গে, ব্যক্তিগত কিছু :

সবার কথা তো জানি না। তবে অবস্কিওরিটির ব্যাপারে নিজের কথা বলতে পারি। বিষয়কে আবছা করা মানে নিজেকে স্পষ্ট করা। কুয়াশার নির্মাণও তো আর্ট, তারও অভিসন্ধি, প্রকরণ, পদ্ধতি

লাগে। অবস্কিওরিটির যে পর্দাটি বস্তু বা বিষয়কে আবছা করে ফেলল তার প্যাটার্নকে খুঁটিয়ে দেখুন। লেখককে দেখতে পাবেন, ইনসাইড আউট।

৫

লোকে চোখের ভাষার কথা বলে। আমি বুঝি না। হুলিয়া দেখে, টেড বান্ডিকে আমার সমাহিত মনে হয়, জীবনানন্দকে খুনী। আর মারিয়াতোরগেতে কেন গেছিলাম, বাড়ির কাছে হুদিংগা, স্তুভস্তায় এত মল থাকতে তাও মনে নেই। তাও তখন শীত, যখন মানুষ নিজের বাসার কাছে পিঠেই আশ্রয় খোঁজে। আশ্রয়, যা আস্তানার থেকে পৃথক। বম্ব-শেল্টারের মত বাংকার, যেখানে পুরুষ্টু ঠোঁটের পেরুভিয়ান মেয়েটি সঙ্গীর নাকে লালাবিজড়িত কামড় দাগলেও কেউ নিজের নখের থেকে চোখ তুলে অন্য কারোর চোখের ভাষা পড়ে উঠতে চায় না। ম্যাগপাইদের হতকুচ্ছিত বাসায় জ্বলজ্বল করে ওঠে গত বছরের রূপোর চামচ। আর আমি ও সোমালি পরাগদের সঙ্গে মারিয়াতোরগেতে, শারহোলমেন থেকে বাস বদলে, লেকে বরফের আস্তর। অস্ফুট একটা আওয়াজে অন্তর্বাসের রিভলভিং র্যা ক থেকে চোখ তুলে দেখি দুটি মেয়ে, গোরা, সোনালি চুল, ৫’২-৩”, একজনের চোখের রঙ আকাশী, অপর ধূসর, ঈষৎ শীর্ণ তারা, দৃষ্টি ফলো করে দেখি এক খাটো, প্রস্থে বিপুল মধ্যবয়স্ক, টাইট গেঞ্জি, পেশী সব ঠিকরে বেরিয়েছে, সঙ্গে নারীপুরুষ মিলিয়ে ৫ জনের টিম, শীতবস্ত্র, ওভারকোট তাদেরই একজনের হাতে। সেই প্রথম চোখের দৃষ্টি আমার বোধ্য হয়, মেয়ে দুটির চোখ “লোলুপ’, আমি লোলুপ শব্দটি এর আগে কোথাও কোনোদিন ব্যবহার করিনি, এ এমন এক শব্দ যা সচেতন বা অ, কোনো দেখাজোকায় মাথায় আসতে পারে বলেই ভাবিনি— সেই শব্দ খুলির ভেতর দিকে বহুদিনের ঘুম থেকে ছিটকে ওঠা পেরেকের মত আঁচড় বেঁধায়।

সে সন্ধ্যায় আমরা ইরানী রেস্ত্রোঁয় জাফরানি পিলাফ খাই, পাশের লেবানিজ দোকান থেকে ফালাফেলও।

আজ আমার বামচামের শর্টসগুলি একত্রে ওয়াশিং মেশিনে, ফলে দেরাজ ঘেঁটে দুটি বক্সার বার করি, ১৪ বছরের পুরনো, সিল্কের ড্রয়ার, ধূসর ও আকাশী। দু একটি সেলাই ইতস্তত খোলা, ইলাস্টিক অক্ষত।

৬

সোনালির কথা আকস্মিক ভাবেই মনে আসে। ‘আকস্মিক’ নিজের কাছে সরল, অপরের কাছে জটিল। আমি এও বুঝতে পারি না, যারা আমার লেখাকে দুর্বোধ্য মনে করে, তারা জাত-পাত-ক্লাসের মত জটিল ব্যাপারে অভ্যস্ত কী-ভাবে? মানুষকে মানুষের মত ভাবা আর টেবিল শেয়ার করার মত সরল আর কিছু আছে না-কি! সোনালি বিশেষ্য। আর বিশেষ্য নিজের দোষগুণ নিয়ে সচেতন, এমনটি আশা করাই যায়— সর্বনামের সে বাধ্য-বাধ্যকতা নেই। সর্বনামের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে বিশেষ্যরা অশেষ ভেবে থাকে যদিও। এই কথাগুলো টাঙ-ইন-চিক, সেও বলে দিতে হলো, কারণ, সর্বনাম পাঠকের সেন্স অফ হিউমার নিয়ে আমি সন্দিহান, আর আমার এখন বয়স ছয়, কিছুক্ষণ পরেই ভোর হবে, আমার সত্তরোর্দ্ধ পিঠ-বাঁকা ঠাকুমা, জেদ যার গায়ে ছিলা হয়ে আছে, কুয়ো থেকে এক বালতি জল তুলবে, কপিকল বেয়ে স্মুথ ওঠা নাইলন দড়ি, দুপ্রান্ত মোমের আগুনে কটারাইজ করা। সেই জলে মুখ ধুতে গিয়ে আমি নাইলন পোড়ার গন্ধ ছাপিয়ে তাতে বয়স্ক মানুষের চামড়ার গন্ধ পাব প্রথমবারের মত। নাক কুঁচকে উঠবে। সেই প্রথম ঠাকুমাকে ভয় পেতে শিখব, পরে বুঝব, এই ভয় আসলে নিজেকে নিয়ে, বয়সকে নিয়ে। সোনালি, সেদিন কাজে আসবে না, সে আগের দিন আমাকে আর আমার খুড়তুতো বোন ভুতনকে বিনা কারণেই চড় মারে, আমি তার হাত ধরতে গেলে কাচের চুড়ি ভেঙে হাতে ফোটে, তার হাত, বিনবিন করে রক্তের ফোঁটা জাগে। ধারা নয়। ডালিমকণা মাত্র। সোনালি কাজে আসেনি, কালী তার বন্ধু, যাকে একদিন রামকৃষ্ণ মঠের বাগানে দেখেছিলাম, ঘন কালো, আর ঝকঝকে হলুদ দাঁত, এসেছে। সে টুথপেস্টের টিউব থেকে আঙুলে তুলে ব্রাশে লাগালে, এই প্রথম আমার ঘেন্নাবোধ জাগবে। একই দিনে ভয় এবং ঘেন্নাকে যুগপৎ বুঝে ওঠা আমার ওপর দীর্ঘস্থায়ী এক প্রভাব ফেলবে। যার ওপর ভিত্তি করে আজ লিখতে বসব— সেই সব দুর্বোধ্য মানুষেরা যারা সামাজিক হায়ারার্কিকে সরল আর আমার লেখাকে দুর্বোধ্য ভাববে, তাদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

৭

সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউজনকে লিখতে বসেছি— ‘মাধবী ভালো আছে। রামদীন দুধ দিতে আসেনি, এক সপ্তাহ হলো, মোড়ের ডিপো থেকে আমুল নিচ্ছি, অগত্যা, গরম পড়েছে অথচ পটল এখনো ৮০, ব্রকোলি কাটলে পোকা বেরোচ্ছে...’।

এইসব খুঁটিনাটি, নিজেকে প্রমাণ করার জন্য। মানুষের সম্পর্ককে প্রয়োজন হয়, বার বার তার ধার গলায় ছুঁইয়ে দেখা, রক্ত বেরোয় কী-না। যে আহত হলো না, তার অস্তিত্ব আছে না-কী? এই লেখাকে কবিতা বলতে চাইবে না কেউ, তাই এ লেখা কবিতা; অস্বীকার তো এক মেথড যা বস্তুকে প্রামাণ্য করে তোলে, যে কুলঝোপ আধজ্বলা, মাটিচাপা দেয়া হল, ধিকিয়ে ধিকিয়ে..., তার অস্বীকার থেকে কাঠকয়লা তৈরী হবে, শীত পড়বে ফের, শীতের রাত্রে মালসায় সে আবার জ্বলবে, বদ্ধ ঘরে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে কারো, সুদূর উত্তরাখণ্ডে, ফরেনসিক রিপোর্ট বলবে মনোক্সাইড পয়জনিং। কাঁটা পোয়েটিক (অন্তত গোলাপে), কার্বন এখনো ততটা নয়, অন্তত যতক্ষণ না সে কোনো ফর্মে রক্তপাতের কারণ হয়ে উঠছে (হীরা যেমন), তবে জাস্টিসকে যে পোয়েটিক হয়ে উঠতে হবেই, এ দাবী রোমান্টিকের।

জাস্টিস ব্যাপারটা যে নির্বিকার তা নয়, শেষমেষ মানুষ বিউটি খুঁজতেই যায়, সৌন্দর্য্য। আশা করে, নিজের ওপর নেমে আসা অত্যাচারও যেন ডিসক্লেমার দিয়ে আসে— পেইন উইল সেট ইউ ফ্রী। এই আশ্বাসটুকুকেই সুন্দর বলে মেনে নেয় কত লোক। নিজের অবস্থা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সে বাহ্যিক আর আন্তরিক সৌন্দর্যের একটা ভেদাভেদ করে, তাকে ক্রমানুসারে ফর্ম আর কন্টেন্ট বলে চিহ্নিত করে, লাল মার্কারে দাগায়।

আমার নিজস্ব আর্গুমেন্ট হলো, যা চিরস্থায়ী, তা বন্দোবস্ত মাত্র। যা বন্দোবস্ত তা কম্প্রোমাইজের ফল। আর্ট কেন কম্প্রোমাইজের ধার ধারবে, তাকে একশো বছর পরেও কেন প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে?

সম্পর্ক ভঙ্গুর যতক্ষণ, ততক্ষণ সে আর্ট। এর ওপর চালাকি, শব্দক্রীড়া, অংগীকার, ইনিয়ে বিনিয়ে কোটেশানে অপরের কথা চালিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন কোথায়—আমি বুঝতে পারি না। আমার অন্ধকার কিছুক্ষণ একজনকে কম্ফোর্ট দেবে, এমন এক অন্ধকার যার মেঝে আছে, পর্যাপ্ত বাতাস আছে, নীরবতা আছে, ফার্নিচার নেই।

—

তবু, ফর্ম যখন মানুষের কাছে ধর্তব্যই তখন নাছোড় আমি উপরের ‘নাকবিতা’-র সূত্রে নিচের লাইনগুলি লিখতে বাধ্য হই—

—

প্রেমে পড়া তো পতনই; স্পন্টানেইটি
ফলিং ইন লাভ।
ফলিং। কেওসে সমর্পণ।
আমি নির্মাণের লোক, উঠে দাঁড়ানোর পক্ষে

আর বুকের মাসল; পেক্টোরালিস, সচেতন সংকোচন- প্রসারণ করি—
স্নেহবস্তু আছড়ায় কোষে—আজ ভারী জল হবে, অম্লজানে জুড়বে কার্বন।
ডানার ঝাপট...আর দূর এসে দুচোখে বিঁধছে
ছেড়ে যাওয়াই এক চূড়ান্ত নির্মাণ
এঁকে, মুছে ফেলার থেকে বড় আর শিল্প আছে নাকি!

৮

প্রথাগত শিল্প, স্রোতে গা ভাসানো। বস্তুত, প্রথাকে বোলস্টার করা; সশক্তিকরণ— অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও কাজের ভলিউম দিয়ে। এক্সপেরিমেন্টাল, যাকে আলগা-ভাবে আভাঁ-গার্দ বা অগ্রণী বলতে ইচ্ছে করছে, সে শুরুতে তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য না হলেও অবচেতনেই কগনিশানকে বাড়ায়। শিল্পের আওতায় আর কী কী আনা যায় তার চৌহদ্দিকে প্রসারিত ক'রে। আপাতভাবে তার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও দেখা যায়, দু'দশ বছরে সে রুচি বদলে দিচ্ছে, সৌন্দর্যবোধকে বদলে দিচ্ছে।
এসমস্তই জানা কথা নিশ্চয়, তবে জানা কথা কি আর রাখতে পারে না দোহারপ্রত্যাশা?
জানা কথাদের, দোহারা চেহারা
সময়ের সাথে তাতে গত্তি লাগে আরো
—মাধব হে, আমিও ঢ্যামনবেশে, ক্লিশেচ্ছাই বিলাই!
ওফ, মারো কোই মুঝে, কোই মারো!
অধিকাংশের কাছেই সৌন্দর্যের প্রকাশ সংহত। ব্যবহারিক উপচারিতার বাইরে বেরিয়ে আসার পর কবিতাও সংহতির মাধ্যমে সুন্দর হয়ে উঠতে চায়। অবশ্যই নানা ধরণের কবিতা লেখা হয়, কিন্তু মুগ্ধতা-আবিষ্টতার কথা বলতে যে কবিতার কথা ভেবে উঠি, তা এক পারফেক্ট মুহূর্তের প্রকাশ। এক ফ্লিটিং ন্যারেটিভে একটি পারফেক্ট মুহূর্ত, স্ট্যান্ড অ্যালোন, স্বয়ং-সম্পূর্ণ—তাকে শাশ্বত, চিরস্থায়ী করে তোলা। সে, সুচারু এক ডিনার টেবিল, চেকড লিনেনের টেবিল ক্লথ, যাতে মানুষ বসে নেই। রূপোর বাটিতে ক্যাভিয়ার, ডাঁটো স্টেমের ক্রিস্টাল গবলেটে কিয়ান্তি। পূর্বাপর নেই। রান্নাঘরের শোরগুল নেই, যে স্টার্জন মাছের পেট চিরে ক্যাভিয়ার বেরুলো, তার ভুগোল, বয়স, বিস্বাদ বাকী দেহাবশেষ, তার কী হলো, মেছুয়া কত কামালো, পরিবেশবিদের ভ্রু কি কুঁচকে উঠলো, আঙুর বাগানে শ্রমিকেরা কী কানাকানি করে, এক নির্দিষ্ট আঙুর বাগানের—শ্যাটু না ভেনিজুয়েলা, চারপাশের বাকী কোন গাছপালা, বনবিভাগ—ওক না মেপল, মাটি, ছত্রাক, সংক্রমণ

এর কোনোটাই নেই। যেন ওই বাঁশবনে রেখে দেয়া বিরহটুকুই সব, বাঁশবনের পোকামাকড়, রাতের শেয়াল, স্বত্ব নিয়ে লাঠালাঠি, ফৌজদারি, শববহনের খাটিয়া বানানোর আগে ধর্মনির্বিশেষে মানুষের লোকাচার—এর কোনোটাই এক্সিস্ট করে না। যেন, সে পুষ্প এক— সাঁজোয়া গাড়ির চাকার পাশে ফুটে ওঠা, অথবা কবরখানায়, বা আস্তাকুড়ের পাশে—সর্বত্রই মালিন্যহীন, মাটির সঙ্গে, সালফার, কার্বন একজস্ট, ধোঁয়া, ধুলোকাদা, চারপাশের জীবজগতের সঙ্গে তার ত্বক জাস্ট সম্পর্করহিত।

এও জানা কথা, তবে, এ 'জানাটির' একহারা চেহারা, মলিন গায়ের রঙ, মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, কোনপিঠ ভাজা— আজ নতুন পোষাকে তাকেও মুহূর্ত কয়, ক্যামেরায় ধরে রাখা যাক।

৯

উপরের কথাগুলো নিয়ে আপত্তি থাকবে, এই স্বাভাবিক। ডিটেলে না গিয়ে আলোচক বলবেন— বেঁড়ে পাকা। আত্মপক্ষকে ডিফেন্ড করা, মানুষের বুনিয়াদি অধিকার, সে সুবাদে বলি— আমি তো কবিতাই লিখতে চাইছি, যা মাহূর্তিক সত্য (মুহূর্ত পেরিয়ে গেল এই), আর পূর্ণত অসত্য। তবু সেন্সিবল মানুষ এরই মধ্যে দর্শনের গন্ধ পেয়ে বলবে—এ'লেখা 'ডাইড্যাক্টিক' (তর্জমায়ঃ হাওয়াই বুলি, উপরন্তু গলে গাঁদাফুল) চোপরাও শালা!

প্রভো হে, সত্য তো আর পূর্বাপরহীন 'ঐশ্বরিক' গুপীযন্ত্র নয়। তাতেও মশল্লা লাগে, আলু ডিম, কেরাসিন, স্থান-কাল-পাত্রও লাগে—মানুষ মরণশীল, জন্মাইলে মরিতে হবে—এমত সত্যেও পাত্র লাগে, জন্মমৃত্যুক্ষণ, আর এক ভৌগলিক স্পেস, যেস্থান থেকে তার নিষ্কৃতি ফিসিক্যালি ধরা যাবে, অ্যাবসেন্স দিয়ে।

সৃষ্টি গ্লোরিয়াস হোক, তবে তার সঙ্গে অতৃপ্তিও নির্মিত থাক, ভুলচুক, মুদ্রাদোষ, জিভের ফাটল, উদাসীনতা—লেখো ঈশ্বর, তার পাশে লিখে দিও ঢ্যাং!

১০

উদাসীনতা যদি সচেতন হয়, তবে তা একটা কাজ। খাওয়া শোয়ার মতই। সব সময় যে উপভোগ্য তাও নয়, চৈত্রের রোদে বেলা দশটায় বাজারে বেরুনোর মত।

স্মৃতি আছে, অনেক, থাকেই, ভালো, মন্দ, মানডেন, সাবলাইম। নস্টালজিয়া আমাকে ভোগায় না। ওই লংগিং, রিভিজিট করতে চাওয়া, স্মৃতির আত্মাকে, বস্তুত, মেরে ফেলে, আত্মা শব্দটা ব্যবহার করতে হল, বেটার কোনো শব্দের অভাবে।

এইসব আমার ছেনি হাতুড়ি, যা দিয়ে স্মৃতিকে রিমডেল করতে বসি, ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে। এর জন্য ডিট্যাচমেন্টের প্রয়োজন। ডিট্যাচমেন্ট মানুষের ফান্ডামেন্টাল রাইট। সোশিওপ্যাথ বলে দাগাবেন না প্লিজ। বরং ডিট্যাচমেন্ট থেকে এমপ্যাথি জাগে। পরা জুতো ছেড়ে না ফেললে অপরের জুতোয় পা গলানো দুষ্কর। এমপ্যাথি আকার পায় অপরকে করুণা করতে শিখলে, পড়ে নিন, কিছুটা ইনফিরিওর ভাবতে শিখলে। শুনতে খারাপ লাগে। কিন্তু এ'সব হলো ক্রিয়েটিভ লেখা, ফলে লিবার্টি নেওয়াই যায়। বিশেষত আমি নিজেকে কথকের থেকে যখন আলাদা করেই ফেলেছি। (ইতিমধ্যে নজরুল লিখতে বসলেন —'বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী', আর ৫০ বছর পর কেউ স্পিরুলিনা ট্যাবলেট গিলে ফরমান দিলে—'কবিরে নবী অইতেই অইব'—নবুয়ত না নবীকরণ সে নিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখি, নিজেকেই করুণা হচ্ছে। রিভিশনিস্টদেরও কি করুণা জাগে? এই ধরণের ইংরেজি শব্দে ইষ্ট, অনিষ্ট দুই থাকে, ঘাড়ে ফেরেস্তা বসিয়ে টাইটরোপ ওয়াকিং, আর কী)।

যেহেতু এখন আমি কথকের থেকে আলাদা, ফলে কথককেও করুণার জন্য তার দুর্বল মুহূর্তকে প্রকাশ করি। ভরতপুরে। অসোয়াস্তি তাকে জাগায়, সে বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে যায়, কমোডে বসে, পায়খানা হয় না। হাঁটুর সামান্য ওপরে ফাঁক হয়ে থাকা জাঙিয়ায় নজর পড়ে, জমা রক্ত, উঠে ফ্লাশ করতে গিয়ে দেখা পড়ে— জল লাল। আতংকে তার ঘাড় ঠাণ্ডা হয়ে যায়। গরম জল চালিয়ে দেয় শাওয়ারে, নিজেকে রগড়ে ধুতে গিয়েও রক্ত বইতে দেখে, মুছতে গিয়ে তোয়ালেতে রঙ লাগে, সে চিৎকার করে বৌকে ডাকে, টিস্যু পেপার দিয়ে পায়ুছিদ্র স্পটিং করে, পাইলস নাকি! কিচ্ছু নেই, বৌ মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে আবিষ্কার করে, স্ক্রোটামে আঁচড়ের দাগ, ঘুমের মধ্যে চুলকোতে গিয়ে আকাটা নখে আঁচড় লেগেছে, নিতান্ত সরু এক সরল রেখা, কিন্তু এত রক্ত!!! যা বোঝা যায়, আঁচড়ের দাগটি নয়, রক্তক্ষরণও নয়, দুর্বল মুহূর্ত হচ্ছে সেই অসহায়তা যা ক্ষরণের সোর্সকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়।

স্মৃতি ওরকমই, যত ছোটই হোক, ক্যাপিলারি দিয়ে নিরন্তর তাতে রক্ত পৌঁছায়। স্মৃতি জীবন্ত। সেও পুষ্ট হয়, ক্ষয় পায়, হুলিয়া বদলে যায়, তারো পেটে অন্য স্মৃতি, বর্তমানও পড়ে। পিত্তথলির পাথরের ব্যথা যেমন চওড়া বেল্টের মত বুক-পেট জুড়ে আঁট হয়ে বসে—ক্ষরণের স্পেসিফিক মুখ

কুয়াশায় হারায়, লাপাতা হয়ে যায়। আজ, বর্তমানের ওপর স্মৃতি চুঁইয়ে পড়ছে, কিন্তু ঠিক কোনখান থেকে, বুঝতেই পারছেন না। জাজমেন্ট তৈরী হচ্ছে...। শুধু মাত্র এইটুকু জানা যে, কাল সোমবার, স্মৃতি অফিস যাবে, লাঞ্চটাইমে টিফিন কেরিয়ার খুলে বিমর্ষ হবে, সন্ধ্যা হলে গান চালিয়ে, অকস্মাৎ পার্টি অ্যারেঞ্জ করে লোকজনকে ডাকবে, মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে চাইবে, অপর এক স্মৃতি তার হাত থেকে চাবি ছিনিয়ে নর্দমায় ছুঁড়ে দেবে।

দুজন মানুষ একত্রে কথা বলতে গেলে খেই হারানো স্বাভাবিক। স্মৃতির অতীতে যাওয়া যাক, আচমকা তার জন্ম হল, জন্ম যা এক ঘটনা, তারপর তার বেড়ে ওঠায় পক্ষ লাগল, পাতিত্বও। আর যারা কবিকে নবী হয়ে ওঠার দাবি জানাচ্ছে, তারা ভুলে যায়, নবী হয়ে উঠতে গেলে কনভিকশান লাগে, কনভিকশানের এক শর্ত হলো, সিলেক্টিভলি একটি মাত্র ইন্দ্রিয়কে এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে ব্যবহার করা, অন্যগুলিকে সুইচ অফ করে।
উদাসীনতার সুবিধে হল ইচ্ছে মত আলোচনা (নিজের সঙ্গে) থেকে বেরিয়ে আসার লাইসেন্স। নিষ্পত্তির তোয়াক্কা না করে। স্মৃতির কথা বলছি, অথচ কগনিটিভ, সেমান্টিক মেমরি ইত্যাদি নিয়ে কথা না বলে বেরিয়ে আসছি, যিনি এতটা পড়লেন, আর লিখলেন তাঁদের আলগা একটা করুণা করছি, মিচকি হাসছি...। এই হাসতে পারাটাও তো ব্যাপার একটা, নয় কী!

বন্ধু প্রশান্তর মুক্তাঞ্চলে এ লেখা প্রথম সংকলিত হয়। ভালোবাসা তাঁকে।